بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৪০। www.motaher21.net

ءَايَةً

" নিদর্শন !"

" Sign !"

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايٰتِنَا لَغٰفِلُونَ

আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হতে পার।' অধিকাংশ মানুষই আমার নিদর্শনাবলী সম্পর্কে নিশ্চিতই উদাসীন।''

[১] এখানে ফির'আউনকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, জলমগ্নতার পর আমি তোমার লাশ পানি থেকে বের করে দেব যাতে তোমার এই মৃতদেহটি তোমার পরবর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তির নিদর্শন ও শিক্ষণীয় হয়ে থাকে। কাতাদা বলেন, সাগর পাড়ি দেবার পর মূসা আলাইহিস সালাম যখন বনী-ইসরাঈলদেরকে ফিরআউনের নিহত হবার সংবাদ দেন, তখন তারা ফির'আউনের ব্যাপারে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল যে, তা অস্বীকার করতে লাগল এবং বলতে লাগল যে, ফিরআউন ধ্বংস হয়নি। আল্লাহ তা'আলা তাদের সঠিক ব্যাপার প্রদর্শন এবং অন্যান্যদের শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে একটি ঢেউয়ের মাধ্যমে ফিরআউনের মৃতদেহটি তীরে এনে ফেলে রাখলেন, যা সবাই প্রত্যক্ষ করল। [তাবারী] তাতে তার ধ্বংসের ব্যাপারে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এল এবং তার লাশ সবার জন্য নিদর্শন হয়ে গেল। লাশের কি পরিণতি হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

[২] অর্থাৎ আমি তো শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক নিদর্শনসমূহ দেখিয়েই যেতে থাকবো, যদিও বেশীর ভাগ লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বড় বড় শিক্ষণীয় নির্দশন দেখেও তাদের চোখ খোলে না। আর জানা কথা যে, ফিরআউন ও তার দলবলের ধবংস ও বনী ইসরাঈলের নাজাত ছিল আশুরার দিনে। [ইবন কাসীর]

সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম সাগর তীরে সেখানে ফেরাউনের লাশ সাগরে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল আজো সে জায়গায়টি অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমান সময়ে এ জায়গাটির নাম জাবালে ফেরাউন বা ফেরাউন পর্বত। এরই কাছাকাছি আছে একটি গরম পানির ঝর্ণা। স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছে হাম্মামে ফেরাউন।

এর অবস্থান স্থল হচ্ছে আবু যানীমর কয়েক মাইল ওপরে উত্তরের দিকে। স্থানীয় লোকেরা এ জায়গাটি চিহ্নিত করে বলে, ফেরাউনের লাশ এখানে পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

এ ডুবন্ত ব্যক্তি যদি মিনফাতাহ ফেরাউন হয়ে থাকে, যাকে আধুনিক গবেষণার মূসার আমলের ফেরাউন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাহলে এর লাশ এখনো কায়রোর যাদু ঘরে রয়েছে। ১৯০৭ সালে স্যার গ্রাফটিন এলিট স্মিথ তার মমির ওপর থেকে যখন পট্টি খুলেছিলেন তখন লাশের ওপর লবনের একটি স্তর জমাটবাঁধা অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। এটি লবণাক্ত পানিতে তার ডুবে যাওয়ার একটি সুস্পষ্ট আলামত ছিল।

অর্থাৎ আমি তো শিক্ষণীয় ও উপদেশমূলক নিদর্শনসমূহ দেখিয়েই যেতে থাকবো, যদিও বেশীর ভাগ লোকদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, বড় বড় শিক্ষণীয় নিদর্শন দেখেও তাদের চোখ খোলে না।

وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ

আল্লাহ তাঁর বাণীর সাহায্যে প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেনই, অপরাধীদের কাছে তা যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন।

এই আয়াতগুলোতে মূসা (عليه السلام) ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য হিসেবে প্রমাণিত করেছেন। আর এগুলো হল ঐ সকল প্রমাণ ও স্পষ্ট দলীল, যা আল্লাহ তা'আলা নিজ কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন এবং যা তিনি নাবীগণকে প্রদান করেছেন। অথবা ঐ সকল মু'জিযা যা আল্লাহ তা'আলার আদেশে নাবীদের হাতে প্রকাশ হত।

সুরা: ইউনুস

আয়াত নং :-83

فَمَآ اٰمَنَ لِمُوْسٰٓى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ عَلٰى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَ مَلَا۟ئِهِمْ اَنْ يَّفْتِنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْاَرْضِ ۚ وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ

(তারপর দেখো) মুসাকে তার কওমের কতিপয় নওজোয়ান৭৮ ছাড়া কেউ মেনে নেয়নি,৭৯ ফেরাউনের ভয়ে এবং তাদের নিজেদেরই কওমের নেতৃস্থানীয় লোকদের ভয়ে। (তাদের আশঙ্কা ছিল) ফেরাউন তাদের ওপর নির্যাতন চালাবে। আর প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ফেরাউন দুনিয়ায় পরাক্রমশালী ছিল এবং সে এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা কোন সীমানা মানে না।৮০

তাফসীর :

কুরআনের মূল বাক্যে ذُرِّيَّةٌ (যুররিয়াতুন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে সন্তান-সন্ততি। আমি এর অনুবাদ করেছি নওজোয়ান। কিন্তু এ বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে কুরআন মজীদে যে কথা বর্ণনা করতে চায় তা হচ্ছে এই যে, বিভীষিকাময় দিনগুলোতে গুটিকয় ছেলেমেয়েই তো সত্যের সাথে সহযোগিতা করার এবং সত্যের পতাকাবাহীকে নিজেদের নেতা হিসেবে মেনে নেয়ার দুঃসাহস করেছিল। কিন্তু মা-বাপ ও জাতির বয়স্ক লোকেরা এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারেনি। তারা তখন বৈষয়িক স্বার্থ পূজা, সুবিধাবাদিতা ও নিরাপদ জীবন যাপনের চিন্তায় এত বেশী বিভোর ছিল যে, এমন কোন সত্যের সাথে সহযোগিতা করতে তারা উদ্যোগী হয়নি যার পথ তারা দেখছিল বিপদসংকুল। বরং তারা উল্টো নওজোয়ানদের পথ রোধ করে দাঁড়াচ্ছিল। তাদেরকে বলছিল, তোমরা মূসার ধারে কাছেও যেয়ো না, অন্যথায় তোমরা নিজেরা ফেরাউনের রোষাগ্নিতে পড়বে এবং আমাদের জন্যও বিপদ ডেকে আনবে।

কুরআনের একথা বিশেষভাবে সুস্পষ্ট করে পেশ করার কারণ হচ্ছে এই যে, মক্কার জনবসতিতেও মুহাম্মাদ ﷺ এর সাথে সহযোগিতা করার জন্য যারা এগিয়ে এসেছিলেন তারাও জাতির বয়স্ক ও বয়োবৃদ্ধ লোক ছিলেন না। বরং তারাও সবাই ছিলেন বয়সে নবীন। আলী ইবনে আবী তালেব (রা.), জাফর ইবনে তাইয়ার (রা.), যুবাইর (রা.), তালহা (রা.), সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.), মুসআব ইবনে উমাইর (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা.) মতো লোকদের বয়স ইসলাম গ্রহণের সময় ২০ বছরের কম ছিল। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), বিলাল (রা.) ও সোহাইবের (রা.) বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ছিল। আবু উবাদাহ ইবনুল জাররাহ (রা.), যায়েদ ইবনে হারেসাহ (রা.), উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) ও উমর ফারুকের (রা.) বয়স ছিল ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। এদের সবার থেকে বেশী বয়সের ছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)। তার বয়স ঈমান আনার সময় ৩৮ বছরের বেশী ছিল না। প্রথমিক মুসলমানদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন সাহাবীর নাম আমরা পাই যার বসয় ছিল নবী (সা.) এর চেয়ে বেশী। তিনি ছিলেন হযরত উবাদাহ ইবনে হারেস মুত্তালাবী (রা.)। আর সম্ভবত সাহাবীগণের সমগ্র দলের মধ্যে একমাত্র হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) ছিলেন নবী (সা.) এর সমবয়সী।

মূল ইবারতে فَمَا اٰمَنَ لِمُوسَى ফামা আমানা লিমুছা শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এতে কেউ কেউ সন্দেহ পোষণ করেছেন, হয়তো বনী ইসরাঈলের সবাই কাফের ছিল এবং শুরুতে তাদের মধ্যে থেকে মাত্র গুটিকয় লোক ঈমান এনেছিল। কিন্তু ঈমান শব্দের পরে যখন লাম ব্যবহৃত হয় তখন সাধারণত এর অর্থ হয় আনুগত্য ও তাবেদারী করা। অর্থাৎ কারোর কথা মেনে নেয়া এবং তার কথায় ওঠাবসা করা। কাজেই মূলত এ শব্দগুলোর ভাবগত অর্থ হচ্ছে, গুটিকয় নওজোয়ানকে বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত বনী ইসরাঈল জাতির কেউই হযরত মুসাকে নিজের নেতা ও পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়ে তার আনুগত্য করতে এবং ইসলামী দাওয়াতের কাজে তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়নি। তারপর পরবর্তী বাক্যাংশ একথা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, তাদের এ কার্যধারার আসল কারণ এ ছিল না যে, হযরত মূসার সত্যবাদী ও তার দাওয়াত সত্য হবার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন সন্দেহ ছিল বরং এর কারণ শুধুমাত্র এই ছিল যে, তারা এবং বিশেষ করে তাদের প্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হযরত মূসার সহযোগী হয়ে ফেরাউনের নির্যাতনের যাতাকলে নিষ্পেষিত হবার ঝুঁকি নিতে রাজী ছিল না। যদিও তারা বংশধারা ও ধর্মীয় উভয় দিক দিয়ে হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ) এর উম্মত ছিল এবং এ দিক দিয়ে তারা সবাই মুসলমান ছিল। কিন্তু দীর্ঘকালীন নৈতিক অবক্ষয় এবং পরাধীনতার ফলে সৃষ্ট কাপুরুষতা তাদের মধ্যে কুফরী ও গোমরাহীর শাসনের বিরুদ্ধে ঈমান ও হেদায়াতের ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে নিজেরা এগিয়ে আসার অথবা যে এগিয়ে এসেছে তাকে সাহায্য করার মত মনোবল অবশিষ্ট রাখেনি।

হযরত মূসা ও ফেরাউনের এ সংঘাতে সাধারণ বনী ইসরাঈলের ভূমিকা কি ছিল? একথা বাইবেলের নিম্নোক্ত অংশ থেকে আমরা জানতে পারি।

পরে ফেরাউনের নিকট ইহতে বাহির হইয়া আসিবার সময় তাহারা মূসার ও হারুণের সাক্ষাত পাইল। তাহারা পথে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহারা তাহাদিগকে কহিল, সদা প্রভু তোমাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিচার করুনঃ কেননা, তোমরা ফেরাউনের দৃষ্টিতে ও তাহার দাসগণের দৃষ্টিতে আমাদিগকে দুর্গন্ধ স্বরুপ করিয়া আমাদের প্রাণনাশার্থে তাহাদের হস্তে খড়গ দিয়াছ। (যাত্রা পুস্তক৫: ২০-২১)

তালমুদে লেখা হয়েছে বনী ইসরাঈল মূসা ও হারুন (আ) কে বলতোঃ "আমাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি নেকড়ে বাঘ একটি ছাগলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং রাখাল এসে নেকড়ের মুখ থেকে ছাগলটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করলো। তাদের উভয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে ছাগলটা টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। ঠিক এভাবেই তোমার ও ফেরাউনের টানা হেঁচড়ায় আমাদের দফা রফা হয়েই যাবে।"

সূরা আরাফে একথাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছেঃ বনী ইসরাইল হযরত মুসাকে বললোঃ

أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا (اية-129)

“তুমি আসার আগেও আমরা নির্যাতিত হয়েছি, তুমি আসার পরেও নিপীড়নের শিকার হচ্ছি।”

মূল ইবারতেمُسْرِفِينَ (মুসরিফীন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, সীমা অতিক্রমকারী। কিন্তু এ শাব্দিক অনুবাদের সাহায্যে তার আসল প্রাণবস্তু সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না। মুসরিফীন শব্দটির আসল অর্থ হচ্ছে, এমন সব লোক যারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য যে কোন নিকৃষ্টতম পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করে না। যারা কোন প্রকার জুলুম, নৈতিকতা বিগর্হিত কাজ এবং যে কোন ধরনের পাশবিকতা ও বর্বরতায় লিপ্ত হতে একটুও কুন্ঠিত হয় না। যারা নিজেদের লালসা ও প্রবৃত্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে। তারা এমন কোন সীমানাই মানে না যেখানে তাদের থেমে যেতে হবে।

আয়াতে বলা হচ্ছে যে, ফির‘আউনের সম্প্রদায়ের কিছু লোক মূসা (عليه السلام)-এর নিদর্শন দেখার পর তারা মূসা (عليه السلام)-এর প্রতি ঈমান আনল। বাকিরা ঈমান আনেনি এই ভয়ে যে, ফির‘আউন তাদেরকে শাস্তি দেবে। কারণ ফির‘আউন ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।

পরবর্তীতে মূসা (عليه السلام) তাদেরকে ভয় মুক্ত হবার জন্য আল্লাহ তা‘আলার ওপর ভরসা করতে বললেন। যদি তোমরা আল্লাহ তা‘আলার ওপর ভরসা কর তবে আল্লাহ তা‘আলার শত্র“ ও তোমাদের শত্র“ ফির‘আউন তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এবং আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য প্রার্থনা কর। তখন তারা একথা শুনে আল্লাহ তা‘আলার ওপর ভরসা করল এবং তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করল এবং ফির‘আউনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তারা আল্লাহ তা‘আলার ওপর ভরসা করার সাথে সাথে আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দু‘আও করেছিল।

আর আল্লাহ তা‘আলা তাদের দু‘আ কবূল করলেন।

সুরা: ইউনুস

আয়াত নং :-87

وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰى وَ اَخِيْهِ اَنْ تَبَوَّاٰ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّ اجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ؕ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

আর আমি মূসা ও তার ভাইকে ইশারা করলাম এই বলে যে, মিসরে নিজের কওমের জন্য কতিপয় গৃহের সংস্থান করো, নিজেদের ঐ গৃহগুলোকে কিবলায় পরিণত করো এবং নামায কায়েম করো। ৮৪ আর ঈমানদারদেরকে সুখবর দাও। ৮৫

তাফসীর :

এ আয়াতটির অর্থের ব্যাপারে মুফাস্সিরদের মধ্যে মতভেদ ঘটেছিল। এর শব্দাবলী এবং যে পরিবেশে এ শব্দাবলী উচ্চারিত হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করে আমি একথা বুঝেছি যে, সম্ভবত মিসরে সরকারের কঠোর নীতি ও নির্যাতন এবং বনী ইসরাঈলের নিজের দুর্বল ঈমানের কারণে ইসরাঈলী ও মিসরীয় মুসলমানদের মধ্যে জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা খতম হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে তাদের ঐক্যগ্রন্থী ছিন্নভিন্ন এবং তাদের দ্বীনি প্রাণসত্তার মৃত্যু ঘটেছিল। এ জন্য এ অবস্থাটিকে নতুন কর কায়েম করার জন্য হযরত মূসাকে হুকুম দেয়া হয়েছিল। তাকে বলা হয়েছিল, জামায়াতবদ্ধভাবে নামায পড়ার জন্য মিসরে কয়েকটি গৃহ নির্মাণ করো অথবা গৃহের ব্যবস্থা করে নাও। কারণ একটি বিকৃত ও বিক্ষিপ্ত মুসলিম জাতির দ্বীনি প্রাণসত্তার পুনরুজ্জীবন এবং তার ইতস্তত ছড়ানো শক্তিকে নতুন করে একত্র করার উদ্দেশ্যে ইসলামী পদ্ধতিতে যে কোন প্রচেষ্টাই চালানো হবে তার প্রথম পদক্ষেপেই অনিবার্যভাবে জামায়াতের সাথে নামায কায়েম করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ গৃহগুলোকে কিবলাহ গণ্য করার যে অর্থ আমি বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, এ গৃহগুলোকে সমগ্র জাতির জন্য কেন্দ্রীয় গুরুত্বের অধিকারী এবং তাদের কেন্দ্রীয় সম্মিলন স্থলে পরিণত করতে হবে। আর এরপরই "নামায কায়েম করো" কথাগুলো বলার মানে হচ্ছে এই যে, পৃথক পৃথকভাবে যার যার জায়গায় নামায পড়ে নেয়ার পরিবর্তে লোকদের এ নির্ধারিত স্থানগুলোয় জামায়েত হয়ে নামায পড়তে হবে। কারণ কুরআন পরিভাষায় যাকে "ইকামাতে সালাত" বলা হয় জামায়াতের সাথে নামায পড়া অনিবার্যভাবে তার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

[১] এখানে

(وَ اجۡعَلُوۡا بُيُوۡتَكُمۡ قِبۡلَةً)

-এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে তা নির্ধারনে কয়েকটি মত রয়েছে–

(এক) কোন কোন মুফাসসিরের মতে এর অর্থ তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কেবলামুখী করে তৈরী করে নাও। যাতে করে সেগুলোতে সালাত আদায় করলে ফিরআউনের লোকেরা বুঝতে না পারে। [ইবন কাসীর]

(দুই) কোন কোন মুফাস্‌সির-এর মতে এর অর্থ তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করে নাও। যাতে সেগুলোতে সালাত আদায় করার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। কারণ পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর সালাত আদায় করার জন্য মসজিদ হওয়া শর্ত ছিল। যেখানে সেখানে সালাত আদায়ের অনুমতি ছিল না। [ইবন কাসীর]

(তিন) কাতাদাহ রাহিমাহুল্লাহ্ বলেনঃ এর অর্থ তোমরা তোমাদের ঘরের মধ্যে মসজিদ বানিয়ে নেবে যাতে তার দিক হয় কেবলার দিকে এবং সেদিকে ফিরে সালাত আদায় করবে। [কুরতুবী] এ আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, সালাত আদায়ের জন্য কেবলামুখী হওয়ার শর্তটি পূর্ববতী নবীগণের সময়ও বিদ্যমান ছিল। [কুরতুবী]

[২] অর্থাৎ কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তখন অর্থ হবে, বর্তমানে ঈমানদারদের ওপর যে হতাশা, ভীতি-বিহবলতা ও নিস্তেজ-নিস্পৃহ ভাব ছেয়ে আছে তা দূর করে তাদেরকে আশান্বিত করুন। তাদেরকে উৎসাহিত ও উদ্যমশীল করুন। অপর মুফাসসিরগণের মতে এখানে মূসা আলাইহিস সালামকেই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। আর এটা বেশী সুস্পষ্ট। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে সুসংবাদ দিন যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে তাদের শত্রুদের উপর বিজয় দান করবেন। [কুরতুবী]

وَقَالَ مُوسٰى رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوٰلًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰىٓ أَمْوٰلِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

মূসা বলল, ‘‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি ফির‘আওন আর তার প্রধানদেরকে এ পার্থিব জগতে চাকচিক্য আর ধন সম্পদ দান করেছ আর এর দ্বারা হে আমাদের রবব! তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে বিচ্যুত করছে, হে আমার প্রতিপালক! তাদের সম্পদ ধ্বংস করে দাও, আর তাদের হৃদয়কে কঠিন করে দাও, যাতে তারা ভয়াবহ ‘আযাব দেখার পূর্ব পর্যন্ত ঈমান আনতে সক্ষম না হয় (যেহেতু তারা বার বার আল্লাহর নিদর্শন দেখেও সত্য দ্বীনের শত্রুতায় অটল হয়ে আছে)।

[১] অর্থাৎ আড়ম্বর, শান-শওকত ও সাংস্কৃতিক জীবনের এমন চিত্তাকর্ষক চাকচিক্য, যার কারণে দুনিয়ার মানুষ তাদের ও তাদের রীতি-নীতির মোহে মত্ত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের পর্যায়ে পৌছার আকাঙ্খা করতে থাকে।

[২] অর্থাৎ উপায়-উপকরণ, যেগুলোর প্রাচুর্যের কারণে নিজেদের কলা-কৌশলসমূহ কার্যকর করা তাদের জন্য সহজসাধ্য ছিল। হে আমাদের রব, আপনিই তাদেরকে এগুলো দিয়েছেন, অথচ আপনি জানতেন যে, আপনি যা নিয়ে তাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন তারা তার উপর ঈমান আনবে না। এটা তো আপনি করেছেন তাদেরকে পরীক্ষামূলক ছাড় দেয়ার জন্য। [ইবন কাসীর]

[৩] এ দো'আটি মূসা আলাইহিস সালাম এমন সময় করেছিলেন যখন একের পর এক সকল নিদর্শন দেখে নেবার এবং দ্বীনের সাক্ষ্য প্রমাণ পূর্ণ হয়ে যাবার পরও ফিরআউন ও তার রাজসভাসদরা সত্যের বিরোধিতার চরম হঠকারিতার সাথে অবিচল ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে পয়গম্বর যে বদদোয়া করেন তা কুফরীর ওপর অবিচল থাকার অনুরূপ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাদেরকে আর ঈমান আনার সুযোগ দেয়া হয় না। মূসা আলাইহিসসালামের এ দোআটি নূহ আলাইহিসসালামের দোআর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেখানে বলা হয়েছেঃ "হে আমার প্রভু! যমীনের বুকে কাফেরদের কোন আস্তানা অবশিষ্ট রাখবেন না; কারণ তাদেরকে যদি আপনি পাকড়াও না করে এমনি ছেড়ে দেন তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং প্রচণ্ড অপরাধী এবং অতিশয় কাফের ছাড়া আর কিছুর জন্মও তারা দেবে না"। [সূরা নূহঃ ২৭]।

অর্থাৎ সে যদিও ঈমান আনে, তবে শাস্তি দেখার পর যেন আনে, যে ঈমান তার জন্য কোন লাভদায়ক হবে না। এখানে কারো মনে এই প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া উচিত নয় যে, পয়গম্বরগণ শুধু হিদায়াতের দু'আ করেন, ধ্বংসের জন্য বদ্দুআ করেন না। কারণ দাওয়াত-তবলীগ এবং সর্বতোভাবে পরিপূর্ণ দলীল পেশ করার পর যখন এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আর ঈমান আনার কোন আশা নেই, তখন শেষ উপায় এটাই থাকে যে, সেই জাতির ব্যাপার আল্লাহর দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া। এটা ঠিক যেন আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে, যা কোন ইচ্ছা ছাড়াই পয়গম্বরদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে। যেমন নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শ বছর তবলীগ করার পর শেষে নিজ সম্প্রদায়ের উপর বদ্দুআ করে বলেছিলেন, (رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارا) "হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।" (সূরা নূহ ৭১:২৬ আয়াত)

সুরা: ইউনুস

আয়াত নং :-89

قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَ لَا تَتَّبِعٰٓنِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

আল্লাহ জবাবে বললেন, তোমাদের দু'জনের দোয়া কবুল করা হলো। তোমরা দু'জন অবিচল থাকো এবং মূর্খদের পথ কখনো অনুসরণ করো না।৯০

তাফসীর :

যারা প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত নয় এবং আল্লাহর মহৎ উদ্দেশ্যে ও মানব কল্যাণ নীতি বুঝে না, তারা মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যের দুর্বলতা, সত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টাকারীদের অনবরত ব্যর্থতা এবং বাতিল

মতাদর্শের নেতৃবৃন্দের বাহ্যিক আড়ম্বর ঐশ্বর্য ও তাদের পার্থিব সাফল্য দেখে ধারণা করতে থাকে, হয়তো মহান আল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীদেরকে এ দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্বশীল দেখতে চান। তারা মনে করে হয়তো আল্লাহ স্বয়ং মিথ্যার মোকাবিলায় সত্যকে সমর্থন করতে চান না, তারপর এ মূর্খের দল শেষ পর্যন্ত নিজেদের বিভ্রান্তিকর অনুমানের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম আসলে অর্থহীন এবং এ অবস্থায় কুফরী ও ফাসেকী শাসনের আওতায় দ্বীনের পথে চলার যে সামান্যতম অনুমতিটুকু পাওয়া যাচ্ছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এ আয়াতে মহান আল্লাহ হযরত মূসা ও তার অনুসারীদেরকে এ ভ্রান্তি থেকে নিজেদের রক্ষা করার তাগিদ করেছেন। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, সবরের সাথে নিজেদের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করে যাও। সাধারণত মূর্খ ও অজ্ঞরা ও ধরনের অবস্থায় যে বিভ্রান্তির শিকার হয় তোমরাও যেন তেমনি বিভ্রান্ত না হও।

وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম আর ফির'আওন ও তার সৈন্য সামন্ত ঔদ্ধত্য ও সীমালঙ্ঘন ক'রে তাদের পেছনে ছুটল, অতঃপর যখন সে ডুবতে শুরু করল তখন সে বলল, 'আমি ঈমান আনছি যে, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই যাঁর প্রতি বানী ইসরাঈল ঈমান এনেছে, আর আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।'

৯০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, আমি বাণী ইসরাইলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম। অর্থাৎ সমুদ্র চিরে তাতে শুষ্ক রাস্তা তৈরী করে দিলাম। যেমন

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ط فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ)

"অতঃপর মূসার প্রতি ওয়াহী করলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পবর্তসদৃশ হয়ে গেল।" (সূরা শুআরা ২৬:৬৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিলেন যে, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। যার ফলে ডান দিকের পানি ডান দিকে এবং বাম দিকের পানি বাম দিকে সরে গিয়ে স্থির হয়ে গেল আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা

তৈরী হয়ে গেল। যা দিয়ে মূসা (عليه السلام) ও তার সৈন্যদল সমুদ্র পার হয়ে চলে গেল। আর ফির'আউন সম্প্রদায় যখন সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছল এমন সময় আল্লাহ তা'আলা দু'দিকের পানিকে একত্র করে দিলেন ফলে ফির'আউন ও তার দলবল পানিতে ডুবে মরল।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ۚ ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ)

"এবং আমি মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে রক্ষা করলাম। অতঃপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে।" (সূরা শুআরা ২৬:৬৫-৬৬)

আর ঐ ডুবে মরার সময় ফির'আউন আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান এনেছিল কিন্তু তার ঈমান কোন কাজে আসেনি। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিচ্ছেন যে, এখন ঈমান এনেছ অথচ এর পূর্বে নাফরমানী করেছ। অতএব এখন ঈমান আনাতে আর কোন লাভ হবে না, কারণ ঈমান আনার সময় চলে গেছে। সে সময় তুমি অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্য ও ফাসাদ সৃষ্টিতে রত ছিলে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার শরীরকে নষ্ট করেননি বরং সযতেন্ন রেখে দিলেন যাতে করে পৃথিবীর সকল অবাধ্য ব্যক্তিরা তার এ শরীর দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং তারা যেন অবাধ্য না হয়। যদি অবাধ্য হয় তাহলে ফেরাউনের মতই অবস্থা হবে। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা বানী-ইসরাইলকে বসবাস করার জন্য একটি সুন্দর জায়গা দিলেন এবং তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করলেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا ط)

"যে সম্প্রদায়কে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত (সিরিয়া) রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করেছি।" (সূরা আ'রাফ ৭:১৩৭) কিন্তু তারা তৎপরবর্তীতে শত্র"তা ও অহঙ্কারবশত বিবাদ করেছিল। যার ফলে তারা প্রাপ্ত নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ءَآلْـٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

'এখন! ইতোপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে [১]।

[১] এ আয়াতে মূসা আলাইহিস সালাম-এর বিখ্যাত মু'জিযা সাগর পাড়ি দেয়া এবং ফিরআনের ডুবে মরার বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে-

(حَتّٰٓى اِذَآ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ ۙ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْٓ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْٓا اِسْرَآءِيْلَ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ)

অর্থাৎ যখন তাকে জলডুবিতে পেয়ে বসল তখন বলে উঠল, আমি ঈমান এনেছি যে, আল্লাহর উপর বনী-ইসরাঈলরা ঈমান এনেছে তাঁকে ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। আর আমি তাঁরই আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর পক্ষ থেকে তার উত্তর দেয়া হয়েছে

(اٰلْـٰٔنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ)

অর্থাৎ কি এতক্ষণে ঈমান এনেছ? অথচ ঈমান আনার এবং ইসলাম গ্রহণের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিক মৃত্যুকালে ঈমান আনা শরীআত অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নয়। বিষয়টির আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ সে হাদীসের দ্বারাও হয়, যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার তাওবা ততক্ষণ পর্যন্তই কবুল করে থাকেন, যতক্ষণ না মৃত্যুর উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়ে যায়। [তিরমিযীঃ ৩৫৩৭]

মৃত্যুকালীন উর্ধ্বশ্বাস বলতে সে সময়কে বুঝানো হয়েছে, যখন জান কবজ করার সময় ফিরিশতা সামনে এসে উপস্থিত হন। তখন কর্মজগত পৃথিবীর জীবন সমাপ্ত হয়ে আখেরাতের হুকুম-আহকাম আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সে সময়কার কোন আমল গ্রহণযোগ্য নয়। এমন সময়ে যে লোক ঈমান গ্রহণ করে, তাকেও মুমিন বলা যাবে না এবং কাফন-দাফনের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন, ফিরআউনের এ ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের নির্দেশেও এটাই সুস্পষ্ট। এ ব্যাপারে অন্য কিছু বলা বা বিশ্বাস করা কুরআন হাদীসের পরিপন্থী।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ফির'আউনের মত মানুষের ওপর অত্যাচার করা যাবে না।

২. মু'মিন ও মুসলিমদের উচিত আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করা ও তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা।

৩. সালাত পরিত্যাগ করা যাবে না।

৪. ভয়ের সময় বাড়িতে মাসজিদ হিসেবে সালাত পড়া জায়েয।

৫. প্রাণ কন্ঠাগত হবার পূর্বেই ঈমান আনতে হবে অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করার পূর্বেই।